দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, শিক্ষার্থীদের অধোগতি ও কয়েকটি প্রশ্ন

এফ. এম আব্দুর রব

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু খুব একটা ফল হয়নি। এ বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের মনে আজকাল একটা হতাশাজনিত আক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'এ দেশে কার কথা কে শোনে'–এরূপ একটি ধারণা মোটামুটিভাবে সর্বত্রই বিরাজমান। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের নামে আমাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের কোন্ পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে–এ নিয়ে চিন্তাভাবনা সব শেষ হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। সবাই যেন যার যার গতানুগতিক কর্তব্যকর্মের জন্য কর্তব্যকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। অতএব কাউকেও কিছু বলা যাচ্ছে না। কাজের ব্যস্ততা ও সময়ের অভাবহেতু কেউ কিছু শুনতেও চাচ্ছেন না। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন চালু করার পর শিক্ষার্থীদের কতটুকু অগ্রগতি বা অধোগতি হয়েছে এ সম্বন্ধে আমি কয়েকটি প্রশ্ন রাখছি। কোন সহৃদয় পাঠক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে আশ্বস্ত করলে আমি অত্যন্ত বাধিত থাকবো।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের জন্য প্রতি বিষয়ের ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর বন্টন করা হয়েছে। ৫০ নম্বরের জন্য ৫০টি টিক চিহ্ন দিতে হবে, কোনকিছু লেখার দরকার নেই। টিক চিহ্নসূচক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপদ ছাড়াও পরীক্ষা জগতে আরও কয়েক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপদ রয়েছে। যেমন সম্পূর্ণকরণ বা শূন্যস্থান পূর্ণকরণ (completion type) পুনরুদ্রেক (recall type) অথবা সংক্ষিপ্ত উত্তর সম্বলিত (short answer type) প্রশ্নপদ ইত্যাদি। যেহেতু কোন ভাষায় ব্যবহারিক ব্যাকরণের উত্তর মূলতঃ ও সর্বদা নৈর্ব্যক্তিক এবং পূর্বে সকল পরীক্ষাতে ব্যাকরণের সকল প্রশ্ন নৈর্ব্যক্তিকই ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে বহুমুখী নির্বাচনধর্মী (muluple choice type) পদ্ধতি ঢালাওভাবে সাজিয়ে এতসব আয়োজনের ব্যবস্থা করা হল কোন্ কারণে? ভাষার ব্যবহারিক জ্ঞান লিখিত ও মৌখিক অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব। সেক্ষেত্রে ৫০% লিখিত অনুশীলনের সুযোগ পরিহার করে ছেলেমেয়েদের সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ভাষা শেখার পথে একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হল। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি? ব্যাকরণ ছাড়া অন্যান্য বিষয়- যেমনঃ ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপদের গুরুত্ব আছে, কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও অন্যান্য শ্রেণীর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপদের বিলোপসাধন করে ১০০% টিক চিহ্নসূচক নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু করা হল কোন্ যুক্তিতে?

টিক চিহ্ন দ্বারা প্রশ্নোত্তর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের চাইতে বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীদের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী ও ফলপ্রসূ। কারণ উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া শিখে জেনে শুনে অনেকটা পরিপক্বতা অর্জন করেছে বিধায় নির্বাচন করে টিক চিহ্ন বসাতে তাদের মনে খুব বেশি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় না। একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র করতে হলে একজন শিক্ষককে ৫০টি সঠিক উত্তর নির্ণয় করে বিভ্রান্তি বা বিচ্যুতিমূলক ১৫০টি বিচলক বা ভুল উত্তর (distractors) তৈরি করার জন্য যে চিন্তা-ভাবনা, শ্রম, সময় ও কাগজ খরচ করতে হচ্ছে, তা বহুলাংশে নিষ্ফল শ্রম ও ব্যয় ছাড়া কিছুই নয়। উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্য বিভ্রান্তিমূলক উত্তর এত ব্যাপকভাবে সরবরাহ করে হঠাৎ তাদের এ রকম টানা- পোড়েনে ফেলে দেবার মধ্যে কি কোন সুফল নিহিত আছে? কথা হলো, পাঠ্যপুস্তকের সংস্কার বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তকে অনুশীলন অধ্যায়ের সাথে পরীক্ষা পদ্ধতির যথাযথ সামঞ্জস্য বা বিন্যাস না করে প্রশ্নপত্র সংস্কারের জন্য আমরা এভাবে উঠে পড়ে লেগেছি কেন?

এ ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাজারে যেসব বড় বড় আকারের নোট বা গাইড বের হচ্ছে সেগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে ছেলে-মেয়েরা কতটুকু প্রত্যাশিত ফলাফল আশা করতে পারে? দেখা গেছে, ঐ ধরনের পুস্তকে ১০০০টি প্রশ্ন করতে গিয়ে ৩০০০টি বিকল্প গুচ্ছ (Alternative Distractors) সঠিক উত্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। সে ভুল উত্তরগুলোও ছেলেমেয়েদের মনোযোগের সাথেই পড়তে হয়। এখানে বলে রাখা দরকার- ভুলেরও একটা সীমা আছে। বহুমুখী নির্বাচনধর্মী প্রশ্নপদ তৈরি করতে প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষককে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে নিতে হবে। তা না করা হলে পরীক্ষকদের অহেতুক বিভ্রান্তি অবধারিত। অন্য কোন শ্রেণীর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের সাহায্যে যদি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপ করা সম্ভব হয় তবে সেক্ষেত্রে জটিলতর বহুমুখী নির্বাচনধর্মী প্রশ্নপত্র পরিহার করাই উত্তম। কোন বিষয়ে গোটা প্রশ্নপত্রের ৫০% প্রশ্নের ৩টি করে বিচলক নিখুঁতভাবে সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি স্কুলে প্রতি বিষয়ে কয়জন করে বিশেষজ্ঞ বর্তমান আছে? অন্যদিকে, এত ব্যাপকভাবে এ ধরনের বাধ্যতামূলক অনুৎপাদী কাজে অধিক সময় ব্যয় করে একজন শিক্ষক কিভাবে ও কখন শিক্ষার্থীদের জন্য বিকাশ-ধর্মী কাজ, যেমনঃ পঠন-পাঠন, নির্দেশনা, পরামর্শ ও ব্যক্তিগত মনোযোগ দেবার সময় করে নিতে সক্ষম হবেন? সময়, শ্রম ও ব্যয়-এ তিনটিকে সুবিন্যস্ত করে সার্বিক অগ্রগতির স্বার্থে নির্বাচন-ধর্মী প্রশ্নের সংখ্যা ব্যাকরণে মোটামুটিভাবে ৮০% এবং অন্যান্য বিষয়ে ৭০% হ্রাস করে সরবরাহ ধর্মী বিভিন্ন শ্রেণীর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা একান্ত বাঞ্ছনীয় ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। কি কি অসুবিধাহেতু ঐসব ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা হলো?

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যবহৃত বিচিত্র ধরনের প্রশ্নমালা ও প্রশ্নধারা বিদ্যমান। শিক্ষার্থীদের অনিসন্ধিৎসু মনের খোরাক মেটাবার জন্য এসব প্রশ্নপত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশ্নধারার গতি-প্রকৃতি পরিহার করে পরীক্ষার তাগিদে নির্বাচনধর্মী প্রশ্নপদের অনুশীলন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। শ্রেণীকক্ষের সীমিত সময়ের মধ্যে এরূপ অনুশীলন কিভাবে সম্ভব? বহুমুখী নির্বাচন প্রশ্নপদ চালু করায় পাশের জন্য সাধারণ ছেলেমেয়েরা পাঠ্যপুস্তক পাঠের প্রতি মোটেই আগ্রহশীল নয়। ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন নিয়েই তারা সাধারণত ব্যস্ত থাকে। রচনাধর্মী প্রশ্নে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে পঠন-পাঠন, জ্ঞান আহরণ বা কিছু শেখার জন্য তাদের আগ্রহ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকগণ চেষ্টা করেও তাদের মনে আশানুরূপ আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারছেন না। তাদের আগ্রহ দ্বিধাবিভক্ত।

কোন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আহরিত জ্ঞান, পারদর্শিতা পরিমাপের জন্য বিষয়-ভিত্তিক সামগ্রিক মূল্যায়নই যথেষ্ট, কিন্তু একটি বিষয়কে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক- এই দুইভাগে বিভক্ত করে এবং সেই বিষয়ের পাশের নম্বরকেও দ্বিখন্ডিত করে কি ধরনের উপকার, অগ্রগতি বা মঙ্গল সাধন করা হলো, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় (Learning process) দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বাধ্যবাধকতা, বৈচিত্র্যহীনতা, অনুমান-প্রবণতা ও অবসাদ অনুপ্রবেশ করে তাদের আগ্রহ, উদ্যোগ ও মন-মানসিকতাকে কিভাবে ব্যাহত করছে, তা বোঝা যাচ্ছে। আমাদের ছেলেমেয়েদের এ অবক্ষয়ের হাত থেকে আজ উদ্ধার করবে কে? পাশের বা শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই যদি এতসব নতুন নতুন উদ্ভাবন, তবে বলার কিছুই নেই। কারণ, এরমধ্যেও হয়তো কোন একটা মঙ্গল নিহিত আছে। কিন্তু, তার পরেও কথা থাকে– ভবিষ্যতে জাতির মেরুদন্ড সমুন্নত থাকবে, সত্যই কি আজ আমরা তা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি?

দুই ছর পূর্বেও মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের যেনতেন একটা মান ছিল, কিন্তু সে মান আজ নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরই স্পষ্ট হয়ে উঠবে উচ মাধ্যমিক পর্যায়ের মান মাধ্যমিক পর্যায়ের কোন্ স্তরে এসে ঠেকে। কি উন্নতি আমাদের! উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এখনও তার পূর্ববৎ স্থিতিশীলতা বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি আমূল সংস্কার করার কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মান সংরক্ষণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে, কিভাবে তা মোকাবেলা করা হবে? অন্যদিকে মাধ্যমিক, নিম্ন ও উচ্চ– এ দুটির পরীক্ষা পদ্ধতিতে ধারাবাহিকতা বা সহগতির (corelation) অভাব কেন?

কোন দেশের পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার বা পরিবর্তন করার পূর্বে আপামর শিক্ষক সমাজের, যারা শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করে থাকেন তাদের একটা মতামত নেয়ার প্রয়োজন আছে। যদি প্রয়োজন নাই থাকলো, তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক-শিক্ষিকার হাত দিয়ে যে অভিনব পদ্ধতির (innovation) সূত্রপাত করা হলো, তার জন্য গোটা সুধী ও শিক্ষক সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নেই কেন? ১৯৯০ সাল-পূর্ব সরকার নকল প্রতিরোধ করার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে রাতারাতি যে নির্বাচনধর্মী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র একচেটিয়া চালু করেন, তা সংশোধন করে ছেলেমেয়েদের অধোগতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের বাধা কোথায়? শিক্ষা-পদ্ধতিতে সংস্কার সাধন করার জন্য দেশে অনেক ক্ষেত্র ছিল, কিন্তু সেদিকে পদচারণ না করে বিগত সরকার যে নতুন ক্ষেত্রটি তৈরি করলো তার মধ্যে আজ আমরা নির্বিবাদে বিচরণ করছি কেন? অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করতে হয়, জাতির শিক্ষা সংস্কারের জন্য আজ আমরা কেন যেন সোজাপথে না গিয়ে বাঁকা বা উল্টোপথেই যাতায়াত শুরু করছি। আমাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারও আর একটি বিব্রতকর ক্ষেত্র সৃষ্টি করে শিক্ষার জন্য দেশে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা বিত্তশালীদের প্রাণঢালা উৎসাহ-উদ্যোগ শিক্ষাঙ্গন থেকে সরিয়ে ফেলেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে দানকর মওকুফের শতাব্দীকালের ঐতিহ্যমন্ডিত ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে যে ক্ষতিটি করা হলো তা পূরণ করবে কে? দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এভাবেই যেন আজ আমরা দিক নির্দেশনা অনেকটা হারিয়ে ফেলছি। পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে তার সরাসরি প্রতিফলন ঘটেছে বলে সবারই তা চোখে পড়ছে। কথা হলো– যা কিছু প্রচলন করা হচ্ছে তাকেই আমরা ধ্রুব সত্য বলে বিনা দ্বিধায় বা প্রতিবাদে গ্রহণ করছি। স্বাধীন ও সচেতন জাতি হিসেবে তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আমরা সসম্মানে সে ঘোষণা মেনে নিতে বদ্ধপরিকর। অতএব, কারো চিন্তাভাবনা করার আর প্রয়োজন নেই। সবকিছুরই সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু লেখাপড়া বা জ্ঞানার্জনে ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতির পরিবর্তে যে অধোগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার মূল্য দেবে কে? ইতিহাস কাউকেও ক্ষমা করবে না। আমাদের আজকের ছেলেমেয়েরাই আগামী দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাদের অগ্রগতির জন্য আমাদের সবাইকে আজ এগিয়ে আসতে হবে। অগ্রগতির কোন সীমা রেখা নেই। উপর থেকে হঠাৎ করে যদি কিছু চাপিয়ে দিয়ে একদিন আমাদের যেন কড়ায়-গন্ডায় তার মূল্য দিতে না হয়। পরিশেষে চিন্তাবিদ এমারসনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি–

'The true test or a civilization is not the cencus, nor the size of the cities, nor the crops, but the king of the country turns out.'

এফ এম আব্দুর রব
অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মির্জাপুর ও বরিশাল ক্যাডেট কলেজ সমূহের সেরা শিক্ষক হিসেবে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত।

আমাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারও আর একটি বিব্রতকর ক্ষেত্র সৃষ্টি করে শিক্ষার জন্য দেশে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা বিত্তশালীদের প্রাণঢালা উৎসাহ-উদ্যোগ শিক্ষাঙ্গন থেকে সরিয়ে ফেলেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে দানকর মওকুফের শতাব্দীকালের ঐতিহ্যমন্ডিত ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে যে ক্ষতিটি করা হলো তা পূরণ করবে কে? দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এভাবেই যেন আজ আমরা দিক নির্দেশনা অনেকটা হারিয়ে ফেলছি। পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে তার সরাসরি প্রতিফলন ঘটেছে বলে সবারই তা চোখে পড়ছে।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩